Downloaded from: justpaste.it/9qyh4

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুয্‌যোহা

আবু ইসলাম

==========

আল্লাহর ইচ্ছার সামনে ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণের স্মৃতি বিজড়িত কোরবানীর ঈদ উদযাপিত হয় বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে। কোরবত শব্দ থেকে কোরবানী। কোরবত অর্থ নৈকট্য। পশু জবেহর মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা হয় বলেই একে কোরবানী বলা হয়। আল্লাহর নির্দেশকে ইবরাহীম (আঃ) অধিক গুরুত্ব দেন, না তাঁর কাছে নিজের সন্তানের মমতাই বড়, এ পরীক্ষা নেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর নামে জবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) সেই ঈমানী পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুত্রের গলায় চালিয়েছিলেন ধারালো ছুরি।

আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ইবরাহীমের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে বধ করা আল্লাহর ইচ্ছা নয় তিনি ইবরাহীম (আঃ) থেকে যা চেয়েছিলেন, তা পেয়ে গেছেন। তাই ধারালো ছুরির কর্তন-শক্তি তিনি রহিত করে দিলেন! ছুরি ইসমাঈলের একটি পশমও কাটলো না। হযরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করে আল্লাহু বললেন, তোমার ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেছে - তুমি সফল। তুমি ঈমানী দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছ।

তবে মানব ইতিহাসে আল্লাহর এহেন একটি কঠোর নির্দেশ পালনের এত বড় ত্যাগের ঘটনা এভাবে কালের স্রোতে ভেসে যাবে, এটা আল্লাহ্‌ চাননি। তিনি এ ঘটনাকে পরবর্তীদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রেরণা হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যাতে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্যে ত্যাগের এ ঘটনাকে অনুপ্রেরক করে রাখলেন। এর বিকল্প হিসাবে প্রতীকী ব্যবস্থা স্বরূপ পশু কোরবানীর নির্দেশ দিলেন। এখন পুত্র নয়-পশু কোরবানীর মধ্য দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) ত্যাগের শিক্ষাকে স্মরণ করে কেউ নিজ জীবন ও চরিত্রকে আল্লাহর অনুগত করে গড়ে তুলতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের দ্বারা তার জন্যে উন্মুক্ত। তা না করে শুধু গোশত খাবার ইচ্ছা কিংবা আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা সেটা অর্জন সম্ভব হবে না।

কোরবানীর মুল ইতিহাস সৃষ্টিকারী হযরত ইবরাহীম (আঃ) - এর ঈমানী দৃঢ়তা ও সংগ্রামী ভূমিকা যেন কোরবানীদাতা ভুলে না যায়, সে জন্যে পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, “তোমরা ইবরাহীমের গোটা সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিমন্থন করো। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি যে ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও ন্যায়ের ওপর অটল থেকেছেন, তোমাদেরও একই ভূমিকা নিতে হবে।

কোরবানীর পশু মোটা-তাজা ও সুদর্শন হওয়া উচিত। হাদীসে এর মাধ্যমে পুলসিরাত পার হবার যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি হয়ত রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ কোরবানীর অনুষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা ও সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সহজ পন্থায় পুলসিরাত পার হবার ব্যবস্থা হবে। কোরবানীর ক্ষেত্রে অধিক মূল্যের পশু হওয়া ইত্যাদি কিছুর মধ্য দিয়ে আসলে বিষয়টির প্রতি কোরবানীদাতার হৃদয়ে

গুরুত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যাদের কোরবানীর পশু ছোট যেমন কেউ খাসি কোরবানী দিয়েছে, তাহলে কি তার ওপর গরু কোরবানীদাতারা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার হয়ে গেল? আর যদি ঐ পশুই পুলসিরাত পার হবার বাহন হবে, তাহলে একটির উপর সাত শরীকদার সওয়ার হবার স্থান কোথায়? এ ছাড়া যাদের উপর কোরবাণী ওয়াজিব নয়, তাহলে তাদের পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যাবার উপায় কি? আসল কথা হচ্ছে তাই যা ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হলো। আল্লাহ তায়ালার কাছে পশুটিই যে বড় কথা নয়, তার বড় প্রমাণ হলো তিনি ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহর কাছে কোরবানীর গোশত রক্ত কিছুই পৌছুবে না - পৌছুবে শুধু কোরবানী থেকে লব্ধ তাকওয়া অর্থাৎ তাকওয়া মণ্ডিত চরিত্রের কর্মফিল।" (সূরা হাজ্জ)।

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার ফলেই ইবরাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় গায়রুল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা হিসাবে সর্বশক্তিমান। কাজেই স্রষ্টার ইচ্ছা না হলে সম্রাট নমরূদের অগ্নিকুণ্ডের আগুনও দাহন শক্তিহীন হতে বাধ্য। বস্তুতঃ নমরুদের অগ্নিকুণ্ড নাতিশীতোষ্ণে পরিণত হবার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই বিশ্বাসেই বস্তুব ফলশ্রুতি মিলেছে। আজ এ দিনেও ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং দ্বীনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে একজন মুমিনকে যেমন অনুরূপ ঈমানী দৃঢ়তার শক্তিশালী হতে হবে, তেমনি হযরত ইবরাহীম (আঃ) - এর মতো বাতিল ও 'তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে হতে হবে আপোষহীন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মানব মনের দুর্বলতার উৎস শিরক তথা গায়রুল্লাহর শক্তিমত্তার উপর মানুষের আস্থার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল এবং এই শক্তির মূল আধারি আল্লাহর ওয়াহ্দানিয়াতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজ সমাজে। কারণ আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের উপর আস্থাই মানুষকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করতে পারে এবং মানব সমাজের তওহিদী ঐক্যই আনতে পারে শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বস্তুতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এভাবেই চেয়েছিলেন ইরাককে কেন্দ্র করে আল্লাহর জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা একটি সুখীসুন্দর, শোষণমুক্ত আল্লাহভক্ত সমাজ গঠন করতে, আর তৎকালীন ইরাক অধিপতি নমরূপ তারই বিরোধিতায় খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। তাই মহাত্যাগী নবীর স্মৃতিবিজড়িত কোরবানী হযরত ইবরাহীমের আদর্শের যথার্থ অনুসরন ছাড়া কিছুতেই সফলতা বয়ে আনতে পারে না। প্রতি বছর কোরবাণী উপলক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষ পশু কোরবানী করা সত্ত্বেও কোরবানীর সেই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত না হবার মুল কারণ এখানেই নিহিত।

যুগ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এ জগতে মানব সমাজে আল্লাহর বহু প্রেরিত পুরুষ অতীত হয়ে গেছেন। তাদের কারোর উপরই মানবজাতির পরিপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ হয়নি। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-ই এ সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহর এই পরিপূর্ণ বিধান মানব সমাজে কার্যকর ও প্রয়োগ একটি কষ্ট ও সংগ্রাম সাধ্য কাজ। এ কাজে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি, জুলুম, নিপীড়ন। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে মস্তবড় ত্যাগের। বস্তুতঃ এ কারণেই অপর কোন নবীর বিশেষ কোনো আদর্শকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পালনীয় না করে হযরত ইবরাহীমের মহত্যিাগের আদর্শ অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ জানেন, আল্লাহ পরিপূর্ণ জীবন বিধান মানব সমাজের প্রতিষ্ঠার দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কাজটিতে চরম ঈমানী পরীক্ষার মুহূর্তে একমাত্র ইবরাহীমী ত্যাগের স্মৃতিই উম্মতে মুহাম্মদীর মস্ত বড় পাথেয় হতে পারে। আমাদের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব-মানবগোষ্ঠী আজ অশান্তির কবলে নিপতিত। সর্বত্রই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মানব সমাজের উপর নমরূদী মনোবৃত্তির প্রভুত্ব চলছে, যদ্দরুন মানুষ আজ অন্যায়-অবিচার শোষণ-নিপীড়নের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। মানবতাকে এ দুর্বিসহ অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে প্রতিটি ঈমানদার কোরবানীদাতার ইবরাহীম (আঃ)

এর জীবনী চেতনা ও ত্যাগের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য। মুমিন-আত্মার ঈমানী শক্তির নতুন উদ্বোধন ঘটাবার জন্যে কোরবানী অনুষ্ঠান প্রতি বছর আমাদেরকে এই আহ্বানই জানিয়ে যায়।

বস্তুতঃ নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত, কষ্টার্জিত সম্পদ ও প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে সমর্পণের উদার আহবান নিয়েই প্রতি বছর কোরবানীর ঈদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কোরবানী একদিকে যেমন ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী; মহান নবী ইবরাহীম (আঃ) এর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেয়, তেমনি প্রতিটি মুমিন অন্তরকে ঈমানী চেতনায় করে তোলে উজ্জীবিত। ঈদুল আযহার দিনে কোরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালাবার পূর্বাহ্নে কোরবানীদাতা যখন উচ্চারণ করেন;

আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার বেঁচে থাকা, মৃত্যু বরণ সব কিছু বিশ্ব-প্রতিপালকের জন্যে”- এ কথার দ্বারা একজন কোরবানীদাতা মূলতঃ নতুন করে আল্লাহর সাথে এই অঙ্গিকারেই আবদ্ধ হয় যে, হে খোদা! হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেভাবে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার বাধাবিপত্তি, অমানুসিক জুলুম-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে তোমার নির্দেশের উপর অটল ছিলেন এবং বাতিলের সাথে আপোষ না করে সামাজিক বয়কট ও রাষ্ট্রীয় চরম দণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে নির্মম মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে ইতস্ততঃ করেননি, আমিও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এজন্যে যদি আমাকে তাঁর মতো দেশান্তরিত হতে হয় তাও রাজি আর যদি রাষ্ট্রীয় রোষাণলে পড়ে জেল-জুলুম এমনকি নির্মম প্রাণদণ্ডাদেশের ন্যায় চরম নির্দেশও শুনতে হয়, সেজন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এছাড়া আমার যেই প্রিয়তম সন্তান আমি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি, তোমার নির্দেশকে সকল কিছুর উপর তুলে ধরতে গিয়ে যদি তারও প্রাণ নাশ বা প্রাণহারার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকেও আমি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। তেমনিভাবে তোমার পথে চলতে গিয়ে যদি প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা কোনো স্বামীই মেনে নিতে রাজি নয়, আমি অনুরূপ পরিস্থিতিতেও তোমার দ্বীনের স্বার্থে হৃষ্টচিত্তে তা করে যাবো।

বলাবাহুল্য, প্রতি বছর কোরবানী অনুষ্ঠানের মধ্য নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে কোটি কোটি পশু যবেহর যদি এটাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশকে সকল কিছুর উপর বলবৎ করার জন্যে মুমিন অন্তরে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের জন্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়, তা হলে ঐ মহান লক্ষ্য আমাদের সমাজে কতদূর পালিত হচ্ছে? কোরবানী অনুষ্ঠানের এদিনে প্রতিটি কোরবানীদাতাকে সেই আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হতে হবে। অন্যথায় এই কোরবানী আপন আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শুধু গোশত ভক্ষণেরই একটি উৎসবে রূপান্তরিত হবে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা যেই উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন, তার স্বাভাবিক দাবী হলো, হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং তাঁর জীবনের শিক্ষা আদর্শকে নিজেদের চলার পথের মশালে পরিণত করা। আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সত্যের উপর আপোষহীন দৃঢ়তা ও অটল ভূমিকার প্রশংসা করার সাথে সাথে বলেছেন, ঘোষণা করে দাও আল্লাহ যা বলেছেন যথার্থই বলেছেন। তোমাদের উচিত নিদ্বিধায় ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করা আর ইবরাহীম শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। না।* – আলে-ইমরান)।

এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) "হানীফ", অর্থ-তিনি আল্লাহর প্রভুত্বে ছিলেন দ্বিধাহীন এবং তাঁর দাসত্ব পালনে ছিলেন একাগ্রচিত্ত। ইবরাহীম (আঃ)-এর গোটা জীবনই এ কথার সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহর খাতিরে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই নিজ পিতাকে ত্যাগ করেছেন। নিজ সমাজকে ছেড়েছেন। আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়েই তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে নিজের বাড়িঘর, আরাম-আয়েশ । আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যেই তাঁকে নিজ জন্মভূমি ইরাকের 'উর' থেকে ফিলিস্তীনে, মিসরে এবং হেজাজে যেতে হয়েছে। যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো - নিজের প্রিয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হলেন। মূলত তিনি তো তাঁর ইচ্ছামত পুত্র ইসমাঈলকে যবেহু করেই ফেলেছিলেন, এটা আলাদা কথা যে, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর খাতিরেই তিনি আপন স্ত্রী এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নির্জন বাস দিয়ে এসেছেন। এক কথায় এমন কোনো ত্যাগ কোরবানী তিনি বাকি রাখেননি যা আল্লাহর জন্যে নিবেদন করেননি।

২) তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো এই যে, জীবনের কোনো পর্যায়ে এমনকি মহাসংকটের মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর প্রতি আস্থায় দ্বিধাস্থিত হননি। আল্লাহর নির্দেশ পালনে যেমন তাঁর কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না , তেমনি আল্লাহকেই তিনি মনে করতেন সর্বশক্তির আধার এবং একমাত্র মুক্তিদাতা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর প্রতিটি মুমিন বান্দার মধ্যে সেই ইবরাহীমী গুণাবলী ও ঈমানী দৃঢ়তাই দেখতে চান। একারণেই মহাত্যাগী ইবরাহীম (আঃ)-এর সগ্রাম জীবনের অনুসরণ করার জন্যে তিনি সূরা আলে-ইমরানের উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সকলকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই আহবানে কতদূর সাড়া দিচ্ছি। প্রতি বছর কোরবানী আসে কোরবানী যায়, আমাদের ব্যক্তি সমাজ ও সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহর জীবনে তার কি প্রতিফলন ঘটছে।

পদে পদে আজ আমরা আপন প্রবৃত্তির পূজা করে যাচ্ছি। ন্যায়, অন্যায়, হালাল, হারাম, হক না হক- কোনো কিছুরই আমাদের মধ্যে আজ তমীয নেই। একদিকে দুর্নীতি, অসাধুতা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে, অপর দিকে আমরা প্রকাশ্যে ইবরাহীম (আঃ)- এর অনুসৃত নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছি। সামান্য অর্থ, সামান্য জমিন, সামান্য পদমর্যাদা ও খ্যতির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বাতিলের সাথে আপোষ করা, অসত্যের আশ্রয় নেয়া, অসত্যের কাছে মাথা নত করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। মুমিন সুলভ দৃঢ়তা ও সৎসাহস হারিয়ে গেছে। সত্য পথ, সত্য মত ও সত্য কথনকে মনে করা হচ্ছে জীবন উন্নয়নের অন্তরায়। চাতুর্য, অসাধুতা, কথাকর্মের বৈপরীত্য ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক চিন্তা আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে যে, আমরা এখন প্রায় সব কিছু বৈষয়িক স্বার্থের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফলে বিদায় নিয়েছে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনের অবস্থাও ইবরাহীমী শিক্ষার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ অবর্ণনীয়। গোটা উম্মতের মধ্যেই যেন এক ঘুণে ধরা অবস্থা বিরাজমান।

বলা বাহুল্য, এভাবে কোনো উম্মতের মধ্যে যখন সামগ্রিকভাবে ঈমানী দৃঢ়তা সম্পন্ন লোকের অভাব দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে এক দিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পারস্পরিক হানাহানির সূত্রপাত ঘটে, অপরদিকে দুনিয়ার বাতিলপন্থী নমরূদদেরও দৌরাত্ব বেড়ে যায়।

মুসলিম সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ইতিহাসের ঠিক এমন এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রায় একই অবস্থান, বিধান ছাড়াও

তাদেরকে দান করেছেন প্রাকৃতিক বহু সম্পদ। তারা ইবরাহীমী ঈমান বলে বলীয়ান হয়ে নিজ নিজ দেশ থেকে নমরূদী বিধিবিধান, ধ্যান-ধারণার উৎখাত করে যদি খোদায়ী ন্যায়-বিধান প্রতিষ্ঠা করতে তাহলে যেমন নিজেদের মধ্যে এত সব আত্মকলহ থাকত না, তেমনি বিজাতীয় কোন নমরূদী শক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বোসনিয়া বা কাশ্মীর কোথাও নিক্ষেপের দন্ত নখাঘাতে মুসলিম জনপদকে ক্ষতবিক্ষত করতে সাহসী হতো না। মৃত্যুর ভয়ে ঈমানী দূর্বলতায় আড়ষ্ট মুসলমান আজ যেমন সকল দিক থেকে নিজের বাসভূমিতে অসহায় বোধ করে, তেমনি নমরূদী বহিঃশত্রুর ভয়ে তারা শংকাগ্রস্থ। আল্লাহ্ না করুন, এ অবস্থা আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে মুসলমানদের নিজ ভূমিতে অবস্থানও কঠিন হয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

আমরা যে মুহূর্তে প্রতি বছর পশুর গলে ছুরি চালিয়ে ঈদুল আযহার কোরবানী উদযাপন করি, সে সময় বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলমান ভাই-বোনেরা নমরূদী শক্তির হাতে যবেহ হতে থাকে। ঈদুল আযহার কোরবানী অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে, প্রতিটি কোরবানীদাতাকে আগে নিজের খোদাদ্রোহী ও স্বার্থপর কুপ্রবৃত্তিকে কোরবানী দিয়ে নিজ সমাজ থেকে আল্লাহর অবাধ্যতাজনিত অন্যায়-অবিচারকে উৎখাত করতে হবে এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ঈমানী তেজ, সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নমরূদী পশুত্বের হাত থেকে মানবতাকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বাঁচত হবে।